মামার বাড়ী

—'স্বপনবুড়ো'

অভিরাম এইবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে, কিন্তু এত বয়েস পর্য্যন্ত তার মামাবাড়ী দেখবার স্নযোগ ঘটেনি। একেবারে খাস কল্‌কাতার ছেলে সে, আর মামা-বাড়ী অজ পাড়াগাঁয়ে। পশ্চিম বাঙ্‌লার ছোট একটা রেল-ষ্টেষনে নেমে বারো মাইল গোরুর গাড়ীতে গেলে, তবে মেলে মাথা-ভাঙা গাঁ।

এককালে এই গাঁয়ে বহু জমিদারের বাস ছিল। আর সবাই নাকি জমিদারী করেছিল ডাকাতি করে। অবশ্য আজকের দিনে এটা নিতান্তই গল্প-কথা।

পরীক্ষা দিয়ে অভিরাম তার মাকে ধরে বসল—এবার সে মামাবাড়ী দেখবেই। পড়াশুনার ক্ষতি হবে, আগে ছিল এই আপত্তি। এখন আর সে-কথা টিকল না। তাই মা, বাবা আর কাকাদের পায়ের ধূলো নিয়ে সে একদিন শ্রীদুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ল তার মামাবাড়ী মাথাভাঙা গাঁয়ের উদ্দেশ্যে।

মাথাভাঙা গাঁয়ে তার মামাবাড়ীর এককালে খুব হাঁক-ডাক ছিল জমিদার-বাড়ী বলে। এখন বাড়ীর লোকজন সব মরতে মরতে এসে দাঁড়িয়েছে ছোটমামা আর ছোট-মামীতে। তাঁদের দু-জনেরই অনেক বয়েস হয়েছে। ছেলেপুলের কোনো বালাই নেই। বিরাট তিন-মহলা বাড়ীতে দুটি প্রাণী কোনো রকমে দিন গুজ্‌রান করেন।

রওনা হবার আগে অভিরামের বাবা তার ছোটমামার নামে টেলি করে দিয়ে-ছিলেন। তাই আশা ছিল, ষ্টেষনে গোরুর গাড়ী থাকবে। ছোট লাইন, ছোট গাড়ী, …আর সেদিন ভীড়ও বেশী ছিল না ওদের গাড়ীতে। কয়েকটি বুড়োগোছের লোক পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি নিয়ে কাছা-কাছি ষ্টেষনগুলিতে নেমে গেল। বাকি রইলেন একটি

ভদ্রলোক—বয়েসে অভিরামের চাইতে বেশ বড়ো। ক্রমাগত বিড়ি ফুঁকছেন আর ঢুলছেন।

গাড়ীতে একমাত্র অভিরামকে দেখে আস্তে আস্তে বেশ আলাপ জমিয়ে ফেল্লেন তিনি।

শুধোলেন, তা খোকাবাবু, কোথায় চলেছ তুমি ?

—আমি খোকাবাবু নই, আমার নাম শ্রীঅভিরাম চট্টোপাধ্যায়।

—বেশ ! বেশ ! তা অভিরামবাবু, কতদূর যাওয়া হবে শুনি ?

—যাব আমার মামাবাড়ী মাথাভাঙা।

ভদ্রলোক এইবার কৌতূহলী হয়ে তাকালেন।

—মাথাভাঙা ! আমিও ত মাথাভাঙা যাচ্ছি। কোন্ বাড়ীতে যাবে তুমি শুনি ? জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোকটি।

অভিরাম এইবার নড়েচড়ে বসল। তাহলে মামাবাড়ীর গাঁয়ের একজন লোক পাওয়া গেল। জবাব দিল, আমার ছোটমামার নাম শ্রীশক্তিসুন্দর চক্রবর্ত্তী।

মনে হল, নামটা শুনেই ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। তারপর্ মুখের ভাবটা চট্ করে বদলে নিয়ে বল্লেন, ও ! চক্কোত্তি-বাড়ী যাচ্ছ তুমি ! বেশ বেশ ! কিন্তু তোমার মা ওখানে যেতে বারণ করেননি ?

অভিরাম হেসে ফেল্ল। জবাব দিল, বা-রে ! মামাবাড়ী যেতে বারণ করবেন কেন ? ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়ে গেছে—কিছুদিন মামাবাড়ী থেকে আসব—একটা নতুন যায়গাও ত দেখা হবে।

ভদ্রলোক চোখ বুজে বিড়ি টানতে টানতে মাথা নেড়ে আপন মনেই যেন বল্লেন, থাকতে পার, সে ত ভালো কথাই।

ভদ্রলোকের কথাবার্ত্তা অভিরামের আদৌ ভালো লাগল না। মামাবাড়ী কে না থাকতে পারে ? ওর বন্ধু-বান্ধবের কাছে কত তাদের মামাবাড়ীর গল্প শুনেছে। সেখানে কত আদর-যত্ন, কত মজা ! নিশ্চয়ই তার ছোটমামার সঙ্গে ভদ্রলোকের ঝগড়া আছে ! নইলে এমন কথা কেউ বলে নাকি !

ট্রেন চলতে থাকাকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ভদ্রলোক বল্লেন, নাঃ, ভোগালে দেখছি। সারা রাস্তা কাদা ভেঙে বাড়ী যেতে হবে।

অভিরাম বল্ল, আমার জন্যে গোরুর গাড়ী আসবে মামাবাড়ী থেকে। আপনি তাতেও যেতে পারেন।

এই সংবাদে ভদ্রলোক ভারী খুশী হয়ে উঠলেন। বল্লেন, তাহলে ত খুব ভালোই হয়।

অভিরাম মনে মনে হাসল। এইবার নিশ্চয়ই লোকটা আর তার মামাবাড়ীর নিন্দে করবে না। কেমন জব্দ!

মাথাভাঙা স্টেষনে যখন গাড়ী এসে পৌঁছল, তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। স্টেষন থেকে বেরুতেই চষা ভিজে মাটির গন্ধ ঠাণ্ডা বাতাসে পাওয়া গেল। দুই পাশের ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলে রাশিরাশি জোনাকি যেন পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে লণ্ঠন ধরে।

কিন্তু কোথায় মামাবাড়ীর গোরুর গাড়ী?

ভদ্রলোকই উৎসাহিত হয়ে হাঁক-ডাক শুরু করে দিলেন।

অন্ধকারে খুলে-রাখা একখানি গোরুর গাড়ীর ভেতর থেকে একজন মুশলমান চাষী বেরিয়ে এল। তার দিকে তাকিয়ে মনে হল, সে যেন এ যুগের মানুষ নয়। কত যে তার বয়েস হয়েছে, ঠাহর করে বলা শক্ত। চোখের ভ্রূগুলি কুঁচ্‌কে গেছে। মাথার সব চুল সাদা।

ট্রেনের ভদ্রলোক তাকে দেখতে পেয়ে বল্লেন, এই যে তুফান, তুমিই গাড়ী নিয়ে এসেছ?

তুফান কোন জবাব দিল না। গাড়ীর ভেতরে মুখ গুঁজে একটা ডিবে জ্বালিয়ে গাড়ীর তলায় ঝুলিয়ে দিল। তারপর আপনমনেই বল্ল, জল এসে পড়েছিল... কখন যে ঘুমিয়ে গেছি—টেরও পাইনি।

তারপর অভিরামের কাছে এসে শুধোল, এই বুঝি আমাদের দিদিমণির ছেলে? রাজপুত্তুরের মতো ছেলে হয়েছে। বেঁচে-বর্ত্তে থাক। হঠাৎ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করল, তা এই বন-বাদাড়ে বেড়াতে আসা কেন? দুনিয়ায় কি আর যায়গা ছিল না!

অভিরামের ভারী মজা লাগে এই পাড়াগেঁয়ে লোকদের কথা শুনে। ওদেরই নাহয় গাঁ ভালো লাগে না! কিন্তু শহরে যারা চিরকাল থাকে, গ্রাম তাদের পক্ষে নিশ্চয়ই নতুন যায়গা! আর, মামাবাড়ীতে বেড়াতে আসতে কে না চায় বল? তবে কি ছোটমামা ভারী কৃপণ? নইলে সকলের মুখেই এই একই রকম কথা কেন? আচ্ছা, দেখাই যাক না কৃপণতার নমুনাটা! ফিরে গিয়ে মাকে খুব ক্ষ্যাপানো যাবে তাহলে।

গাড়ী চলার সঙ্গে সঙ্গে তুফানের মুখের কামাই নেই। মামাবাড়ীর সেকালের গল্প বলে চলেছে অনর্গল। তিন-মহলা বাড়ী—লোকজন গমগম্ করত। বারো-মাসে তের-পার্ব্বণ! দোল-দুর্গোৎসব ঘটা করে হত। হিন্দু-মুশলমান প্রজা সব একসঙ্গে প্রসাদ পেত। চক্কোত্তি-বাড়ীতে নিত্যি-নতুন যাত্রা, পাঁচালী, কেত্তন, খ্যাম্‌টা, বাই-নাচ লেগেই

থাকত। দশটা গাঁয়ের লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ত এই বাড়ীতে। এই তিন-মহলা বাড়ীর সঙ্গে পুকুরই ছিল পাঁচটা—বাইরে তিনটে আর অন্দরে দুটো। আত্মীয়-স্বজন অতিথ-ফকির কারো কামাই ছিল না! তুফান এই বাড়ীতে ঢুকেছিল চৌদ্দ বছর বয়েসে লাঠিয়াল হিসেবে, আজও সে চক্কোত্তি-বাড়ীর মায়া কাটাতে পারেনি—গোরুর গাড়ী চালায়—ধানী জমি থেকে ধান বয়ে নিয়ে আসে—পুকুরগুলোর মাছ বিক্রির ব্যবস্থা করে—এই ভাবে দিন চলে যাচ্ছে একরকম করে। অভিরামের মাকে সে কোলে-কাঁখে করে মানুষ করেছে। তারও তিনকুলে কেউ নেই, ছোটবাবুরও কোনো ছেলেপিলে হল না! তাই কেউ কাউকে ছাড়তে পারে না। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই ভাবেই বোধ করি চলবে।

ভদ্রলোক খানিকটা আগেই নেমে গিয়েছিলেন। সারাটা পথ তিনি বিশেষ কোনো কথাই বলেননি। আর অভিরাম চোখ দুটি বড়ো বড়ো করে কেবলি তুফানের কথা গিলেছে আর ক্রমাগত 'হুঁ' দিয়ে গেছে।

অবশেষে গাড়ী এসে ঢুকল চক্কোত্তি-বাড়ীর বাইরের মহলের প্রাঙ্গণে। চার-দিকে যে-নক্সা-কাটা লোহার রেলিং ছিল, ভেঙে খসে পড়েছে। বিরাট বাড়ীটাকে রূপকথার গল্পের নিঝুম পুরী বলে মনে হচ্ছিল।

তিন-মহলা বাড়ীর একেবারে শেষ প্রান্তে ছোট মামা-মামী থাকেন। বহু উঠোন আর অনেক ভাঙা দরজা পেরিয়ে সেখানে পৌঁছুতে হবে। ওদের ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো বাদুড় ডানা ঝট্‌পট্‌ করে উড়ে গেল। চামচিকের দল ভাঙা কার্নিশের পাশে পাখা ঝাপ্‌টাতে লাগল।

তুফানের পেছন পেছন অভিরাম চোখ-ভরা কৌতূহল আর মন-ভরা স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলে। এই তার মামাবাড়ী! একদিন এখানে হাজার হাজার ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলে উঠত। যাত্রা-গানে, পাঁচালীর পদে, কীর্ত্তনের করতালে মুখরিত হয়ে উঠত··· আজ শুধু একটা বিরাট ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তুপ ছাড়া সে কিছুই মনে করতে পারছে না! ইতিহাসের ছাত্র অভিরাম,—এইভাবে কত বিরাট রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে, সেই কথাই তার মনে ছায়াছবির মতো ভেসে উঠছে!

ছোটমামা আর ছোটমামী অত রাত পর্য্যন্ত তার আগমন-আশায় লণ্ঠন জ্বালিয়ে বসেছিলেন। নইলে এ বাড়ীতে সন্ধ্যের পর কেউ নাকি আর জেগে থাকে না—বেলাবেলি যাহক খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকিয়ে পিদিম নিভিয়ে শয্যায় আশ্রয় নেয়।

মামা-মামীর দিকে তাকিয়ে অভিরামের মনে হল, ওঁরা যেন নিঝুম পুরীর মানুষ··· ···এইমাত্র যেন ওঁদের দু-জনকার দেহে প্রাণ ফিরে এসেছে······ দেহে কারো এতটুকু

রক্ত নেই······বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকলেই ওঁদের যেন মানায় ভালো। কথা যদি আদৌ না বলতে হয়—শুধু ইশারা আর ইঙ্গিতে কাজ চলে যায়, তবেই যেন বেঁচে যান ওঁরা!

অভিরামের দেহ-মনও খুব ক্লান্ত ছিল। বেশী কথা বলবার ইচ্ছে যেন তারও নেই। কিছু খেয়ে নিয়ে বিছানায় গা গড়িয়ে দিতে চায় সে।

ছোটমামী নিঃশব্দে খাবারের ঢাকনিটা খুলে একটা আসন পেতে দিলেন। সত্যি প্রচুর আয়োজন করে রেখেছেন মামী। নিজেদের ক্ষেতের ধানের সরু চালের ভাত, পুকুরের মাছ, মাছের মুড়ো, ছানার ডাল্না, নিজেদের গোয়ালের গোরুর দুধের সুন্দর পায়েস, ঘরে পাতা দৈ-সন্দেশ—সব নাকি মামীমার নিজের হাতের তৈরী। খেতে খেতে অভিরাম ভাবতে লাগল, এমন সব টাট্‌কা খাবার খেয়েও মামা-মামীর চেহারা রক্তশূন্য কেন? এই বাড়ীটা কি রক্তচোষা বাদুড়ের মতো ওঁদের দেহের সব রক্ত শুষে নেয়?

নিঝুম থম্‌থমে বিরাট তে-মহলা বাড়ী। মামা-মামী যদি কিছু না বলেন, তবে তুফানের কাছ থেকেই এই বাড়ীর সব গল্প সে শুনে নেবে। আজ রাত্তিরে বেশ খানিকটা ঘুম তার দরকার।

ছোটমামা একবার শুধু বল্লেন, আমাদের ঘরেই অভির একটা বিছানা করে দাও······অনেক রাত হয়ে গেছে।

অভিরাম মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে বল্ল, না-না, এক ঘরে তিনজনে থাকবার কি দরকার? ওই ত দোতলার ঘরগুলি খালি পড়ে আছে। তারই একটাতে আমি বিছানা পেতে নেব'খন। খোলা হাওয়া না হলে আমার আবার ঘুম আসে না।

ছোটমামা আর ছোটমামী এমন ভাবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন যে, এই রকম অদ্ভুত কথা তাঁরা কখনো শোনেননি!

ছোটমামা আবার মৃদু আপত্তি তুললেন। ওপরে একা একা থাকবার দরকার কি? আমাদের সঙ্গে এক ঘরে শুলেই ত হয়।

কিন্তু অভিরাম কোনো কথাই শুনল না। ক্ষিদের মুখে প্রচুর খেয়ে নিয়েছিল সে। এখন খোলা হাওয়ায় হাত-পা ছড়িয়ে গা গড়িয়ে দিতে পারলে বাঁচে।

মামা-মামীর আপত্তি বিশেষ কানে না তুলে দোতলার একটা দক্ষিণ-খোলা ঘরে শোওয়ার ব্যবস্থা করে নিল অভিরাম। নিচে থেকে এক একবার দম্‌কা হাওয়ায় রজনীগন্ধার মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। জান্‌লার তলাতেই বোধ করি ফুলের

বাগান। অন্ধকারে কিছু চোখে পড়ে না, শুধু মাথার ওপরকার আকাশে অসংখ্য তারাদল ঝিকিমিকি করতে থাকে।

কালপুরুষ একদিকে ঢলে পড়েছে। রাত্রি গভীর। রজনীগন্ধার গন্ধ-মাখানো মিষ্টি হাওয়াটি মায়ের ঘুম-পাড়ানি গানের মতো অতি সহজেই অভিরামকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

ঘুমের ভেতর একটা মৃদু অথচ স্পষ্ট গানের কলি শুনে অভিরামের তন্দ্রা কেটে গেল। ঘুমটা ভাঙলেও চট্ করে সে তাকাতে পারল না।

তার পাশের ঘরের থেকেই গানটা ভেসে আসছে। হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল, তার ঘর আর পাশের ঘরের মধ্যে যে বড় দরজাটা বন্ধ ছিল, সেটা একেবারে খোলা। তারই ভেতর দিয়ে মৃদু আলোকে চোখে পড়ছে, একটি মহিলা প্রকাণ্ড একখানি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গুণ্‌গুণ্ করে গান গাইছেন আর চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছেন। এ বাড়ীতে ছোটমামা আর মামী ছাড়া কেউ থাকে না—এই কথাই সে জানত। হয়ত ছোটমামীর কোনো আত্মীয়া এসেছেন হালে। তাহলে ত ওপরে এসে শোয়া ঠিক হয়নি। বিছানা থেকে সে উঠবে কিনা এই কথা যখন সে ভাবছিল, হঠাৎ তখন তার খেয়াল হল, শোবার সময় ত কোনো আলো জ্বালা ছিল না! ঘরের ভেতর একটা মৃদু আলো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কোথাও লণ্ঠন কিম্বা পিদিম নেই! এই অদেখা আলোর উৎস কোথায়? এই কথা যখন সে চিন্তা করছিল, সেই সময় খুব উঁচু থেকে একটা বেলোয়াড়ি ঝাড়-লণ্ঠন সশব্দে ভেঙে পড়লে যেমন শব্দ হয়, সেই জাতীয় একটা আওয়াজে চমকে উঠে পাশের ঘরের দিকে তাকাতেই অভিরাম শিউরে উঠল।

সেই মহিলাটি হঠাৎ ফিরে তাকিয়েছেন। দেখতে এত সুন্দরী কিন্তু মাথা থেকে শুরু করে চোখের ভ্রূ পর্য্যন্ত কে যেন দায়ের কোপে কেটে ফেলেছে—ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত পড়ছে। তার দিকে তাকিয়ে মহিলাটি খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন।

সেই হাসি শুনে মনে হল—বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে সে যেন তলিয়ে যাচ্ছে—নিঃশ্বাস নেবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তার নেই।

যখন জ্ঞান হল, তাকিয়ে দেখল ঘর আগের মতোই অন্ধকার। তবু চারদিকে ফিস্ ফিস্ কথাবার্ত্তার শব্দ......এপাশে-ওপাশে নিঃশব্দ পদক্ষেপ। অনেক লোক এদিক-ওদিক যাতায়াত করছে, ইশারা-ইঙ্গিতে কি-সব কথা বলছে—সব অনুভব করা যাচ্ছে, কিন্তু কাউকে চোখে দেখা যাচ্ছে না।

অভিরামের ইচ্ছে হল, বিছানা ছেড়ে উঠে নিচে চলে যাবে। কিন্তু তার সমস্ত দেহটা যেন বিছানার সঙ্গে আট্‌কে গেছে—হাত নাড়বার পর্য্যন্ত ক্ষমতা তার নেই! ঘাড় ও পিঠের পাশ দিয়ে কল্ কল্ করে ঘাম ছুটছে কিন্তু পাশ ফেরবার কিম্বা মুছে নেবার ক্ষমতা তার লোপ পেয়েছে!

হঠাৎ পাশের ঘরের দিকে তার চোখ পড়ল—আবার সেই মৃদু আলো!

কয়েকটি ভদ্রলোক খেতে বসেছেন। দেখে মনে হয় খুব বড়লোক। হাতে আঙটি ঝক্ ঝক্ করছে। গলায় সোনার চেন—কোঁকড়া চুল, গৌর বর্ণ। দামী ধুতি-জামা পরণে। নানা রকম খাদ্যের আয়োজন করা হয়েছে। থালার পাশে সারি সারি বাটি। হঠাৎ দেখা গেল, ভদ্রলোকদের পেছনে দা, তরোয়াল আর লাঠি হাতে দুশ্‌মন চেহারার কতকগুলি ষণ্ডা লোক উঁকি-ঝুঁকি মারছে। পরমুহূর্ত্তেই বুক-ফাটা চীৎকার শোনা গেল—বাঁচাও—বাঁচাও—খুন্—খুন্!!

অভিরামের ওঠবার ক্ষমতা নেই, তবু দুই চোখ বিস্ফারিত করে দেখল, যমদূতের মতো ষণ্ডা লোকগুলি ভদ্রলোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—লাল রক্তে থালার ভাত রাঙা হয়ে গেল—সোনার গয়নাগুলি কাড়াকাড়ি করে তারা ছিনিয়ে নিতে লাগল······

চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছেন। (পৃঃ ২৮৯)

বুক-ফাটা চীৎকার আর শয়তানের অট্টহাসি সেই তে-মহলা বাড়ীর এপাশ

থেকে ওপাশ অবধি কম্পন জাগিয়ে তুলল—কোথায় যেন একটা কালো বেড়াল বিকট কণ্ঠে ম্যাঁও-ম্যাঁও করে ডাকতে লাগল……

অভিরামের আর কিছু মনে নেই!

সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে আবার সে তলিয়ে গেল!

• •

কার যেন একটা গরম দীর্ঘনিঃশ্বাস কানের পাশ দিয়ে ঘাড়ে এসে লাগছে!

প্রথমটা অভিরাম ঠিক ঠাহর করতে পারেনি।

মনে হয়েছে, অতিরিক্ত গরমে সে কেবলি হাঁস-ফাঁস করছে! রাত্রে বেশী খেলে পেট গরম হয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে বারে বারে ঘুম ভেঙে যায়!

একে নতুন যায়গা—তার ওপর ছোটমামীর আদরে খাওয়া হয়েছে প্রচুর। সে হয়ত ক্রমাগত দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠছে। কাল মামীকে বলতে হবে, রাত্রে এত খাওয়ার আয়োজন করলে চলবে না।

বালিশটা আঁকড়ে ধরে আবার পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমের আরাধনা করতে লাগল সে!

হঠাৎ পুরোনো বাড়ীর চামচিকেগুলো অবধি ভয় পেয়ে উঠল কেন? ওরা কার্ণিশের কোণে কোণে, আলমারীর কাচে, বড় বড় ছবির আশে-পাশে কেবলি ডানা ঝাপ্‌টাতে লাগল।

কি যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত পেয়েছে ওরা।

বাঁচাও—বাঁচাও—খুন—খুন!! (পৃঃ ২৯০)

এমন কতকগুলি প্রাণী তে-মহলা বাড়ীর আঁধারে জেগে উঠেছে, যাদের অস্তিত্ব ওরা অনুভব করতে পারছে কিন্তু তাদের চোখে দেখা যায় না!

জানালার পাশেই কি-গাছের একটা মরা ডাল হাওয়ায় দুলছে। একটা কাল পেঁচা এমন একটা বিকট সুরে চীৎকার করে উঠল যে, কাউকে ডাকবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত অভিরামের লোপ পেয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে সে ভাবছে, উঠে নিচে ছোটমামার ঘরে এবার সত্যিই চলে যাবে, কিন্তু চেষ্টা করে দেখল, সে-ক্ষমতা তার নেই! কে যেন তার দেহে স্ক্রু এঁটে দিয়েছে। এখান থেকে নড়বার শক্তি সে হারিয়েছে! এই জন্যেই কি তার মামা-মামী এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে পারে না? কোনো কায়াহীন কি তাঁদের দেহের রক্ত শুষে নিচ্ছে রোজ রাত্তিরে?

না—না—আজকের যুগের ছেলে সে—এই সব আজগুবি ভূতের গল্প সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। সকালবেলা স্নান সেরে ভালো করে মাথা ঠাণ্ডা করতে হবে।

আবার পাশ ফিরে শোয় অভিরাম।

কিন্তু সেই গরম নিঃশ্বাস আবার ঘাড়ের ওপর অনুভব করে।

মরিয়া হয়ে সে চোখ মেলে তাকাল।

দেখল, আপাদমস্তক সাদা থান-পরা একটি মহিলা তার শিয়র থেকে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন; তারপর তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

অভিরাম বিস্ময় অনুভব করল—খানিকক্ষণ আগেও তার যে-দেহ পাথরের মতো অসাড় হয়ে পড়েছিল, তা এখন উঠে বসেছে।

অন্ধকারের মাঝখান থেকে আবার সেই হাতছানি অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠল।

সে উঠে দাঁড়াল।

তারপর—সেই ইঙ্গিতকে অনুসরণ করে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। যাকে ভালো করে চোখে দেখা যায় না—মুখ যার অদৃশ্য, তার আকর্ষণ যে এমন দুর্নিবার হতে পারে, সে-কথা অভিরামের হৃদয়ঙ্গম করবার ক্ষমতা নেই! সে শুধু চলেছে—ভাঙা দরজার পর দরজা অতিক্রম করে, মহলের পর মহল পেছনে ফেলে একেবারে ডানদিককার বাগানে এসে উপস্থিত হল।

দূরে আবার সেই সাদা থান-পরা অশরীরী হাতছানি! সে ইশারা করে একটা জীর্ণপ্রায় কুয়োর মধ্যে তর্ তর্ করে নেমে গেল।

অভিরাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে চল্ল।

একটা আশ্স্যাওড়া গাছ কুয়োর ওপরটা তার ঝাপ্ড়া ডালপালা দিয়ে ঢেকে রেখেছে। কিসের প্রবল টানে সে স্রোতের কুটোর মতো সেই দিকে ভেসে চল্ল।

কুয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তাকে। মনে হচ্ছে, ওইখানে গেলে তার দেহ শীতল হবে। অস্ফুটকণ্ঠে সে বল্ল, যাই—যাই—

ভাঙা কুয়োর পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে অভিরাম। এত অন্ধকার, তবু কুয়োর ভেতর থেকে সেই হাতছানি চোখে পড়ছে!

লাফিয়ে পড়তে যাবে, এমন সময় দূর থেকে চীৎকার শোনা গেল—খোকাবাবু, পালাও—পালাও!

তুফান ডাকছে তার কুঁড়েঘরের দাওয়া থেকে। তিন-মহলা দালানে সে শোয় না—বাইরে কুঁড়ে তৈরী করে থাকে।

নিচে সেই শীতল হাতছানি—আর দূর থেকে তুফানের চীৎকার!

হঠাৎ তন্দ্রা টুটে গেল অভিরামের!

তাইত! এ কি করতে যাচ্ছিল সে! অতল কুয়োর মধ্যে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল!

তখনও তুফানের চীৎকার ভেসে আসছে—খোকাবাবু, পালাও—পালাও—

আর এক মুহূর্ত সেখানে না দাঁড়িয়ে অভিরাম তার মামাবাড়ী ছেড়ে পাগোলের মতো রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল। পেছনে একটা অট্টহাসি তাকে কেবলি ব্যঙ্গ করে অনুসরণ করতে লাগল যেন!

কতক্ষণ যে ছুটেছে, তাও খেয়াল নেই।

হঠাৎ একটা লোকের গায়ের ওপর সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাইত! গত রাত্তিরের সেই ট্রেণ-যাত্রী ভদ্রলোক!

তিনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, একি অভিরামবাবু, সক্কালবেলা মামাবাড়ী ছেড়ে পাগোলের মতো কোথায় ছুটেছ?

অভিরাম তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। শুধু ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভদ্রলোক তখন তাকে জড়িয়ে ধরলেন। বল্লেন, মোহের ভাবটা তোমার এখনো কাটেনি। চলো আমার সঙ্গে—স্টেষনে যাচ্ছ ত? আমিও সকালের ট্রেণে ফিরছি।

অভিভূতের মতো অভিরাম বল্ল, হ্যাঁ, আমিও ফিরে যাব। আমায় নিয়ে চলুন আপনি—

ভদ্রলোক চলতে চলতে বল্লেন, তোমার ভাগ্যি ভালো, ভাই, যে, ওই তে-মহলা বাড়ীর গ্রাস থেকে ফিরে এসেছ!

সে অবাক হয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে রইল। কোনো প্রশ্ন পর্য্যন্ত তাঁকে করতে পারল না।

তখন ভদ্রলোক বল্লেন, আচ্ছা শোনো তাহলে আসল ঘটনাটা। তোমার দাদামশায়ের বাবা একজন নাম-করা জমিদার ছিলেন। নাম-করা জমিদার মানেই দুর্দ্দান্ত ডাকাত। সেকালে ডাকাতি করেই লোকে বিস্তর জমিদারী ভোগ করতেন।

একবার তোমার দাদামশায়ের বাবা ঝড়-জলের রাত্তিরে এক ধনী পরিবারকে আশ্রয় দেন। তাঁরা পূজোর ছুটিতে নিজেদের দেশে যাচ্ছিলেন। খুব ধুমধাম করে পূজো করবেন বলে তাঁদের সঙ্গে নিয়েছিলেন বহু টাকা, আর ছিল বিস্তর গয়নাগাটি।

চক্কোত্তিদের বিরাট জমিদার-বাড়ীর দোতলায় তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হল। খাওয়া-দাওয়ার প্রচুর আয়োজন করা হল। কিন্তু যখন তাঁরা খেতে বসলেন,

জমিদারের পাইকরা সবাইকে আক্রমণ করে পশুর মতো হত্যা করল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল, কিন্তু চক্কোত্তিরা প্রচুর টাকা আর গয়নাগাটি ছিনিয়ে নিয়ে মৃতদেহগুলি রাতারাতি বাগানে পুঁতে রাখলেন। সেই থেকে অন্ধকার রাত্তিরে নিশির ডাকে বিছানা ছেড়ে উঠে চক্কোত্তি-বাড়ীর কত মানুষ যে বাগানের কুয়োতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে, তার আর লেখা-জোখা নেই! আজ সেই তিন-মহলা বাড়ী শ্মশান হয়ে গেছে। তোমার ছোটমামা চক্কোত্তি-বাড়ীর শেষ বংশধর। কিন্তু তার কোনো ছেলেপুলে হয়নি।

অভিরাম রুদ্ধ নিঃশ্বাসে এই গল্প শুনছিল। ইতিমধ্যে তারা ষ্টেষনের পথে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে।

পূবাকাশে তরুণ তপন সবে উঁকি দিচ্ছে—রাতের অন্ধকার কেটে গেছে!

ভদ্রলোকের সঙ্গে পথ চলতে চলতে অভিরামের মনে হল—গোটা ব্যাপারটাই একটা দুঃস্বপ্ন—না—সব সত্য?

ডেভী-সেফ্‌টি-ল্যাম্প

নিউকাসেলের বিশপ জন হজসন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাম্‌ফ্রী ডেভীর সঙ্গে বসে চা-পান করছিলেন। চা-পান করতে করতে বিশপ বল্লেন, কয়লা ইংলণ্ডের সম্পদ বটে কিন্তু এই কয়লার খনিতে কাজ করতে গিয়ে কত নিরীহ শ্রমিক যে প্রাণ দিচ্ছে, তা আর ইয়ত্তা করা যায় না। এ দৃশ্য সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

কয়লার খনির ভেতর চির অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কাজ করবার জন্যে খনির কুলীদের বাধ্য হয়েই আলো নিয়ে যেতে হয় কিন্তু মাঝে মাঝে কুলীদের অজ্ঞাতে সেই খনির ভেতরে এমন সব গ্যাস জমা হয়ে থাকে, সেখানে আলো নিয়ে গেলেই, একটা ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে যায়। হতভাগ্য কুলীরা সেইখানেই কয়লা-চাপা হয়ে মরে যায়। মানুষ সম্পদের জন্যে খনির সন্ধান পেয়েছে বটে কিন্তু সেই খনিতে কাজ করতে গিয়ে দলে দলে লোক প্রাণ দিতে বাধ্য হয়।

বিশপের কাছ থেকে সেই কথা শুনে ডেভী সেই সমস্যা দূর করবার জন্যে একরকম বৈদ্যুতিক আলোর টর্চ্চ তৈরী করলেন, ডেভীর ল্যাম্প বলে তা আজ জগতে প্রসিদ্ধ। সেই আলোর টর্চ্চ জগতের হাজার হাজার খনির কুলীদের অকাল মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছে।